Avgiv GKwU ¯‡ci K_v e‡jwQ| wj‡LwQ †ij KvjPv‡ii K_v| cv‡ki †`k fviZmn wewfb †`‡k †ij KvjPvi wQ‡jv| mg‡qi mv‡_ †mUv Avi I mmsnZ n‡q‡Q| Avgiv †Kb cwiwb - G ck Kiv Le mnR| ck bv K‡i GB cwZ‡e`‡b Avgiv e‡jwQ wKQ D‡`¨vM, mgm¨v, m¤vebv I ¯‡ci K_v| Gme ev¯ evqb n‡j †ij n‡q DV‡e ... লিখেছেন **সাইফুল হাসান**

†ij L‡q KvjPvi

জামিল আহমেদ সপরিবারে চট্টগ্রামে বাস করেন। গ্রামের বাড়ি রাজশাহী। বছরে এক-দু'বার বাড়ি আসতে হয়। প্রায় ৬০০ কিলোমিটার পথ ভ্রমণের জন্য রেলওয়ে তাদের প্রথম পছন্দ। চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা ট্রেনে চেপে বসলে প্রায় ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে তারা গন্তব্যে পৌঁছাতেন। সময় একটু বেশি লাগলেও ট্রেন ছাড়া কখনও বাসের কথা এ পরিবার ভাবেননি। ঝমঝম শব্দ তুলে ট্রেন যখন ছুটে চলে তখন মনে অন্য রকম এক শিহরণ তৈরি হয়। জামিল আহমেদ দম্পতির কৈশোরে পা দেয়া দু'সন্তান জানালার পাশে বসার জন্য রীতিমতো যুদ্ধ করতো। কারণ ট্রেনে জানালার পাশে বসার মজাই আলাদা। ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে যেন গাছ, গ্রাম, মানুষ দৌড়াচ্ছে। কিন্তু সবকিছু পিছনে ফেলে ট্রেন এগিয়ে চলে। ব্যাপারটা ভাবতেই কিশোরদ্বয় রোমাঞ্চ অনুভব করে। পাশাপাশি দীর্ঘ ভ্রমণে কতো অজানা লোক সঙ্গী হয়। কথা প্রসঙ্গে এসব অনাত্মীয় লোকগুলোও কখনও কখনও আত্মীয় হয়ে ওঠে। অজানা কোনো স্টেশনে ক্ষণিক পরিচয়ের লোকটি যখন নেমে যায় তখন বুকের কোনায় একটু বুঝি ব্যথাও জাগে। জামিল সাহেবের দীর্ঘ জীবনে বরাবরই এমন ঘটনা ঘটেছে। ভ্রমণের ২৪ ঘণ্টা এই দম্পতির জন্য ট্রেন হয়ে উঠতো পরিবারের অংশ। ভ্রমণের জন্য ট্রেনকে বেছে নেয়ার অন্যতম কারণ হলো নিরাপত্তা ও ঝক্কি ঝামেলাহীন ভ্রমণ। পথের কোথাও ট্রাফিক জ্যাম নেই। সরু দু'টি লোহার পাতের ওপর বিশালদেহী একটি ট্রেন ছুটছে তো ছুটছেই। মাঝে মাঝে স্টেশনে থেমে যাত্রী নামাচ্ছে ওঠাচ্ছে। জামিল সাহেবের কাছে ট্রেন হলো বিভিন্ন রঙের বর্ণের মানুষের মহামিলন স্থান। কথাগুলো বলতে গিয়ে জামিল তার ছাত্র জীবনের কথায় চলে যান। আসলে তিনি ট্রেনে বসে সেই যৌবনে চলে যান। রাজশাহী থেকে ঢাকা আসতেন দল বেঁধে, সে স্মৃতি এখনো তাড়িত করে।

বছর দশেক হলো এই দম্পতি ট্রেন ভ্রমণ ছেড়ে দিয়েছেন। ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাসে তারা

ভ্রমণ করেন। ট্রেন এখন চলার পথে হঠাৎ করেই মাঝ পথে থেমে যায়, হকারের ঝামেলা, উটকো লোকের মাস্তানি, পাশাপাশি সেবা জিনিসটা যেন রেল কর্তৃপক্ষ নির্বাসনে পাঠিয়েছে। এ অবস্থায় রেলওয়ে ভ্রমণ না করাই যে কারো জন্য সঙ্গত। রেলওয়ে ভারত উপমহাদেশের সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভারতীয় ট্যুরিজমের বিশাল নেট ওয়ার্কে রেলওয়ের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর সব অংশের জন্যই কথাটা সত্য। বাংলাদেশেও এক সময় রেলওয়ে ছিলো পরিবহন ও দেশীয় সংস্কৃতির অন্যতম। মানুষের জীবন থেকে তা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। অনেক দূরে। রেলওয়ে একটি জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ নানা ধরনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারতো। যা একদা ছিল। যাকে রীতিমত পালা করে শেষ করা হয়েছে। সচল ঐতিহ্যের বিলুপ্তি ঘটানো হচ্ছে।

ভারতবর্ষে সভ্যতার শুরু

ব্রিটিশ শাসনামলে প্রথম এ উপমহাদেশে রেলওয়ে যাত্রা শুরু করে। সময়টা মধ্য উনবিংশ শতক। ব্রিটিশ সরকার ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি সঞ্চারের পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য রেলওয়েকে এ দেশের মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। পাশাপাশি পুরো ভারত উপমহাদেশ রেলওয়ের মাধ্যমেই প্রথম যান্ত্রিক সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হয়। দৈত্যাকৃতির এই পরিবহন অতি অল্প সময়ের মধ্যে মানুষের মন জয় করে। সময়ের পরিক্রমায় ভারতসহ তৎকালীন উপনিবেশের প্রায় সকল অংশেই রেলপথ বৃদ্ধি পায়। সে সময় কোলকাতা ছিল বাণিজ্যের প্রধানকেন্দ্র। ফলে ভারত উপমহাদেশের ট্রেনগুলোর গন্তব্য ছিল কোলকাতামুখী। আজকের বাংলাদেশে গত শতাব্দীর প্রথমদিকে প্রথম ট্রেন লাইন স্থাপন হয় দর্শনা থেকে জগতি পর্যন্ত। পরে তা প্রসারিত হয়। বাণিজ্যিক কারণে তৎকালীন পূর্ববাংলাও অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ ছিল ব্রিটিশ সরকারের কাছে। কোলকাতা থেকে উত্তরমুখী লাইন নির্মাণ হয়। হার্ডিঞ্জ ব্রিজের মত বড় অর্থ ব্যয়ে পদ্মা অতিক্রম করে লাইন সেই আমলে। কারণ উত্তর বঙ্গের পাট, আখ, আসাম-সিলেটের চা বাগান। নিজেদের স্বার্থেই তারা আজকের বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অংশকে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের মধ্যে নিয়ে আসে। রেলওয়ে শুরু থেকেই জাতিগত উন্নয়ন, জীবনযাপনে বিশাল প্রভাব ফেলে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ে বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান মকবুল আহমেদ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'রেলওয়েই প্রথম বারের মতো 'ইনহাউজ' বিদ্যুৎ তৈরি ও ব্যবহার করে। বহু শহরে রেলওয়ে নিজ খরচে বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছে। রেলওয়ে এ দেশের মানুষকে আধুনিক বিচার ব্যবস্থার সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। আজকে বাংলাদেশের ব্যবসার প্রধান গেটওয়ে চট্টগ্রাম বন্দর ও রেলওয়ে তৈরি করেছিলো। দেশজুড়ে টেলিযোগাযোগ রেলওয়ের মাধ্যমে হতো। ছোট শহরের ভালো রেস্তোরাঁটা, ম্যাগাজিনের দোকান রেলওয়েতে হতো। প্ল্যাটফর্ম টিকেট কেটে মানুষ স্টেশনে ঢুকতো। এখন? এ কথাগুলি এজন্য বলছি কারণ রেলওয়ে যেমন আমাদের আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, তেমনি অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে ভূমিকা রেখেছে।'

একেকটি বড় রাস্তা নির্মাণের পেছনে প্রতি বছর যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, তার অর্ধেক অর্থও যদি রেলওয়ের পেছনে ব্যয় করা সম্ভব হতো তাহলে পুরো বাংলাদেশ নেটওয়ার্কের আওতায় চলে আসতো

পাশাপাশি আধুনিক সভ্যতায় অভ্যস্ত মানুষ সময়ের ধারাবাহিকতায় সভ্যতাকে তার জীবনযাপনের অংশ করে নিয়েছে।

ভারত ভাগের পর বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার পূর্ব বাংলার রেলওয়ের উন্নয়নের পরিকল্পনা নিলেও শেষ পর্যন্ত খুব বেশি লাভ হয়নি। তারপরও বাংলাদেশ রেলওয়ের যতোটা উন্নতি সাধিত হয়েছে তার অধিকাংশই পাকিস্তান আমলে। সে সময় এ বাংলায় কয়েকশ' কিলোমিটার রেলওয়ে সংযোগ সড়ক স্থাপিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের পর এসব সড়কের বেশ কিছু বন্ধ হয়ে গেছে। অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশে রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য তেমন কোনো পরিকল্পনা নেয়া হয়নি। কাগজে কলমে কিছু পরিকল্পনা নেয়া হলেও তা ঐ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। রেলওয়ে জাতির কল্যাণে নানাবিধভাবে ব্যবহার হতে পারতো কিন্তু সম্ভাবনাময় এ ক্ষেত্র রাষ্ট্রীয় বৈষম্যে ধ্বংসের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে যোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'ঢাকা দেশের রাজধানী। সুতরাং দেশের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে রেলওয়ের উন্নয়ন হওয়া উচিত ঢাকাকেন্দ্রিক। এ দেশে দীর্ঘদিন ধরেই রেলওয়েকে নির্জীব করার চেষ্টা চলছে। যারা চেষ্টা করেছে তারা সফলও। রেলওয়ে সরকারের দিক থেকে কোনো উৎসাহ পায়নি। ফলে রেলওয়ের মধ্যে একটা হতাশা এসেছিল। আমি নানা কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের উজ্জীবিত করার চেষ্টা করছি।'

রাজধানী রেলওয়ে বাঁচাতে পারে

গত ৩৩ বছরের ঢাকাকেন্দ্রিক সবকিছুই বেড়েছে। মানুষ বেড়েছে, গাড়ি বেড়েছে, আকাশমুখী বিল্ডিং বেড়েছে, সন্ত্রাস, দুর্নীতি বেড়েছে, মানুষের আয়ের তুলনায় ব্যয় বেড়েছে বহুগুণ। শুধু রেলওয়ে বাড়েনি। বরং পরিকল্পনাহীনতার কারণে রেল রাজধানী থেকে নির্বাসিত প্রায়।

যেকোনো দেশের প্রধান উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয় রাজধানীকেন্দ্রিক। রাজধানী থেকেই সারাদেশের উন্নয়নের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। স্বাধীনতা- পরবর্তী সময়ে কাজের সন্ধানে মানুষ ঢাকামুখী হয়েছে। দেশের অন্যান্য শহরে তেমন কাজের সুযোগ না থাকায় মানুষ ঢাকামুখী হতে বাধ্য হয়েছে। ঢাকাও গ্রাম থেকে আসা লাখ/কোটি মানুষকে বরণ করে নিয়েছে। রাজধানী হিসেবে আয়তন না বাড়লেও মানুষের চাপে ঢাকা বেড়েছে। শহরের আয়তনের তুলনায় প্রায় ৭ গুণ বেশি মানুষ এখানে বাস করে। লোক সংখ্যার চাপ সামলাতে না পেরে ট্রাফিক ব্যবস্থা ভেঙে গেছে। অন্যদিকে রাস্তার স্বল্পতা তো আছেই।

ঢাকার মতো ক্ষুদ্র একটি শহরে ১৩ হাজার সিএনজি, কয়েক হাজার বাস, প্রায় লাখের কাছাকাছি প্রাইভেট কার, মাইক্রো চলাচল করে। এছাড়া ট্রাক, লরি, রিকশা-এসবের হিসাব না হয় বাদই গেলো। বিশাল জনসংখ্যা আর গাড়ির চাপে যে কোনো শহরই ভেঙে পড়তে বাধ্য।

রাজধানীকে এ অবস্থা থেকে বাঁচাতে পারতো রেল। সেই সুযোগ সর্বদাই ছিলো। কিন্তু কোনো সরকারই তা গ্রহণ করেনি। ঢাকা শহরের যারা বাসিন্দা তাদের আয়ের মোটা একটি অংশ ব্যয় হয় যাতায়াত খাতে। একমাত্র টোকিও ছাড়া সম্ভবত পৃথিবীর আর কোথাও পরিবহন খাতে এতো অর্থ মানুষ ব্যয় করে না।

ইন্টারনেট ও বিভিন্ন জার্নাল ঘেঁটে দেখা গেছে, পৃথিবীর সব দেশেই পরিবহন সেক্টরে নেতৃত্ব দেয় রেলওয়ে। পৃথিবীর সব বড় শহরের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো রেলওয়ে নেটওয়ার্ক দ্বারা সংযুক্ত। রেলওয়ে স্টেশনগুলো মূলত শহরের প্রাণকেন্দ্রে তৈরি হয়। অনেক আগে ঢাকায়ও সে ব্যবস্থা ছিলো। পরে ঢাকার প্রধান রেলস্টেশনকে কমলাপুরের মতো এক কোনায় স্থানান্তর করা হয়। ফলে রাজধানী শহর থেকে রেলওয়েও দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়। রেলওয়ের জায়গা দখল করে ছোট ছোট বাস। যার কু-প্রভাব বহন করে সাধারণ মানুষ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আজকে গুলশান থেকে কেউ

ধানমন্ডি আসতে চাইলে তাকে ট্যাক্সি ভাড়া দিতে হয় ১০০ টাকারও বেশি। কিন্তু গুলশান থেকে ধানমন্ডি পর্যন্ত যদি রেল সংযোগ থাকতো, তাহলে একজন মানুষের ব্যয় হতো সর্বোচ্চ ৫ টাকা। পাশাপাশি গুলশান থেকে ধানমন্ডি পৌঁছাতে তার যে সময় লেগেছে তার অনেক কম লাগতো ট্রেনে। রেলওয়েতে খরচ কম, একসঙ্গে অনেক লোক ভ্রমণ করতে পারে। তার চেয়ে বড় কথা নিরাপত্তা রেলওয়ের প্রধান অনুষঙ্গ। সড়ক পথের তুলনায় রেলওয়ের এতো বেশি সুবিধা থাকার পরও রাজনীতিবিদরা ঢাকায় রেলওয়েকে প্রতিষ্ঠিত করেনি। পরিকল্পনাবিদরা এ ব্যাপারে কোনো সরকারকে সহযোগিতা করেছে বলে জানা যায়নি। আরও একটি উদাহরণ চোখের সামনেই আছে। যেমন ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ সড়ক পথে সময় লাগে প্রায় দু'ঘন্টা। কিন্তু বেসরকারি খাতে ঢাকা থেকে প্রতিদিন নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত দুটি ট্রেন চলে। প্রচুর যাত্রীও হয়। সময় লাগে মাত্র আধা ঘন্টা। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের ট্রেন সময়মতো না চললেও প্রচুর মানুষ এই ট্রেনের ওপর নির্ভরশীল। এদের যাতায়াতে সময় যেমন কম লাগে তেমনি অর্থও সাশ্রয় হয়। অর্থাৎ রেলওয়ে মানুষকে নিরাপদ ভ্রমণ আর অর্থ সাশ্রয়ের নিশ্চয়তা দিতে সব সময়ই সক্ষম ছিল।

অন্যদিকে রাজধানীকে চাপমুক্ত রাখার জন্য সব দেশেই রাজধানীর পার্শ্ববর্তী এলাকার সঙ্গে চমৎকার যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। এ ক্ষেত্রেও প্রধান ভূমিকা রেলওয়ের। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের দিকে তাকালেই ব্যাপারটা বোঝা যায়। প্রতিটি জেলার সঙ্গেই কোলকাতার ট্রেন যোগাযোগ চমৎকার। ফলে একজন মানুষকে চাকরি সূত্রে কোলকাতা শহরেই বাস করতে হয় না। পার্শ্ববর্তী জেলা শহরগুলোতে বসবাস করলেই চলে। এতে ঐ চাকরিজীবীর জীবনযাত্রার ব্যয় কমে, রেলওয়ে হয়ে ওঠে বেঁচে থাকার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেখানে 'ডেইলি প্যাসেঞ্জার' একটি কথা আছে জীবনযাপনে, সাহিত্যে। যে কাজটি বাস করতে অক্ষম।

এক হিসাবে দেখা যায়, একটি ১৫ বগির ট্রেনে এক সঙ্গে প্রায় ৫০০ বাসের যাত্রী ভ্রমণ করতে পারে। আর ট্রেনের ব্যয় তো ঐতিহাসিকভাবে বাসের তুলনায় কম। রাষ্ট্রের পরিকল্পনা প্রণেতারা এই সহজ জিনিসটা এত বছরেও কেন বুঝে উঠতে পারলো না সেটাও একটা প্রশ্ন বটে। আজকে যদি নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, মানিকগঞ্জের সঙ্গে ঢাকার ডবল লাইনের রেলওয়ে সংযোগ থাকতো তবে ঢাকার ওপর জনসংখ্যার চাপ যেমন কমতো, তেমনি জনগণের জীবনে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকা পরিবহন ব্যয়ও সহনশীল পর্যায়ে নেমে আসতো। ঢাকা শহর সীমাবদ্ধ থাকতো না।

বাংলাদেশ রেলওয়ের সাবেক মহাপরিচালক আব্দুর রহিম সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমাদের সময় ঢাকাকেন্দ্রিক একটি স্কিম ছিল। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর পর্যন্ত ৪ লাইনের একটা প্রজেক্ট প্রস্তাব ছিলো। পরবর্তীতে সরকারের অবহেলার কারণে এটা করা সম্ভব হয়নি। আমাদের পরিকল্পনা ছিলো বাসের মতো প্রতি মিনিটে ট্রেন ছেড়ে যাবে। যাতে মানুষ পরিবহন নিয়ে কোনো সমস্যায় না থাকে। ৪ লাইনে ট্রেন আসবে যাবে, পথে যানজটের ভয় নেই। ফলে পার্শ্ববর্তী শহর থেকে মানুষ অল্প সময়ের মধ্যে তার কর্মক্ষেত্রে আসতে পারতো এবং সময় মতো ফিরে যেতে পারতো। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সরকারি অসহযোগিতার কারণে প্রজেক্টটা করা সম্ভব হয়নি।'

পাকিস্তান আমলে পুরান ঢাকার ফুলবাড়িয়া ছিল প্রধান রেলস্টেশন। তেজগাঁও-ফুলবাড়িয়া-গেন্ডারিয়া পর্যন্ত রেল সড়ক তৎকালীন প্রধান ঢাকাকে তার নেটওয়ার্কের আওতায় এনেছিল। ১৯৬৮ সালে ফুলবাড়িয়া থেকে রেল স্টেশন সরিয়ে কমলাপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। পাশাপাশি পুরান ঢাকাকেন্দ্রিক এই রেল সড়ক বন্ধ করে দেয়া হয়। রেলওয়ে বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান মকবুল আহমেদ বলেন, 'মানষ যেমন তার ছায়া এড়াতে পারে না, তেমনি রেলওয়ে প্রধান শহর ছাড়া বাঁচতে পারে না। ফুলবাড়িয়ার রাস্তাটা এখনও আছে। এর কনফিগারেশনও ঠিক আছে। এখানে জমি একোয়ার করতে হবে না। তেজগাঁও থেকে একটা ডাবল লাইন টেনে নিলেই হয়। এর জন্য প্রয়োজন শুধু কয়েকটি ওভারব্রিজ। তাছাড়া রেললাইন অনেক সস্তা।' অন্য একটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমাদের সময় ঢাকাকেন্দ্রিক একটা সার্কুলার ট্রেন চালুর কথা ছিলো। সরকারের উদাসীনতার কারণে সেটাও হয়ে ওঠেনি।'

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর রেল সেক্টরের দিকে নজর দিয়েছে। রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয় বেশ কিছু ভালো প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে। তার মধ্যে ঢাকাকেন্দ্রিক রেলওয়ে অন্যতম। এ সংক্রান্ত প্রস্তাবনাও রেলওয়ে তৈরি করেছে। যোগাযোগমন্ত্রী সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমরা ঢাকাকেন্দ্রিক কমিউটার ট্রেন চালু করবো। ঢাকার সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর ও সাভার পর্যন্ত ডবল গেজ লাইন হবে। আগামী অর্থবছর থেকে কাজ শুরু হবে। এটা আমি করবোই। এমনভাবে করবো যাতে কোনো প্রধান রাস্তা ক্রস করতে না হয়।'

তবে রেলওয়ের সাবেক একজন কর্মকর্তা পরিচয় গোপন রাখার শর্তে বলেন, 'গত সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সদরঘাট, গুলিস্তান, তেজগাঁও, মহাখালী, ধানমন্ডি, উত্তরাকেন্দ্রিক একটি মনোরেল বা ইএমআরটিএস (Elevated Mass Railway transit System) উদ্যোগ নিয়ে ছিলো। প্রকল্পটি ম্যাচিউরডও হয়েছিলো। টেন্ডার শেষে একটা পার্টি কাজও পেয়েছিলো। যতদূর শুনেছি, যারা কাজ পেয়েছিলো তারা আওয়ামী লীগ মানসিকতার বলে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে কাজটা আটকে দেয়। ঐ প্রজেক্টটা শুরু হলে এত দিনে কাজ শেষ হতো।' শুধু রাজনৈতিক কারণে এমন একটি প্রকল্প শুরুই হতে পারেনি। তবে রেলওয়ের এডিজি (অবকাঠামো) এমডি আবদুল্লাহ বলেন, 'প্রজেক্ট বাতিল হয়নি। প্রকল্পটি যখন নেয়া হয় তখন সঠিক পরিকল্পনা অনুযায়ী নেয়া হয়নি। এ প্রজেক্টের সম্ভাব্যতা আমরা যাচাই করে

গাজীপুর, মানিকগঞ্জের সঙ্গে ঢাকার ডবল লাইনের রেলওয়ে সংযোগ থাকতো তবে ঢাকার ওপর জনসংখ্যার চাপ যেমন কমতো, তেমনি জনগণের জীবনে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকা পরিবহন ব্যয়ও সহনশীল পর্যায়ে নেমে আসতো। ঢাকা শহর সীমাবদ্ধ থাকতো না

দেখছি। এ বিষয়ে একটা STP প্রজেক্ট আমরা নিয়েছি।'

রাষ্ট্রীয় বৈষম্য রেলপথ ধ্বংসের কারণ

দেশে বর্তমানে রেলপথের দৈর্ঘ্য ২৮৫৮.৭৩ কি.মি। স্টেশন ৪৬৬টি। কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ৩৪ হাজার। পাকিস্তানের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলাদেশ রেলপথ পেয়েছিলো ২৮০০ কিলোমিটারের কিছু কম। এতো বছরে মাত্র ৫৯ কিলোমিটার রেলপথ বেড়েছে। এতেই বোঝা যায়, কোনো সরকারই রেলওয়ের উন্নয়নের দিকে নজর দেয়নি। সরকারি এক হিসাবে দেখা যায়, ১৯৮০-৮৫ অর্থবছরগুলোতে সরকারের বরাদ্দ ছিলো রেলপথে ৩৩, সড়কপথে ৩৭ ও জলপথে ৩০ শতাংশ। ২০০০-০৩ অর্থবছরে গড় হিসাবে দেখা যায়, সড়কপথে বরাদ্দের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৫ শতাংশে, যেখানে রেলওয়ে ও জলপথের বরাদ্দের পরিমাণ মাত্র ২৪ ও ১ শতাংশ। রাষ্ট্রীয় এই বৈষম্যই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় রেলওয়ের প্রতি সরকারের উদাসীনতা কোন পর্যায়ে ছিলো, যা এখন পর্যন্ত অব্যাহত।

এর কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায়, রেলওয়ে ধ্বংসের পেছনে বিশ্বরাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের রেলওয়ের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ অন্যতম। বিদেশীরা সড়কপথের জন্য সাহায্য দিয়েছে। ফলে হাজার হাজার কিলোমিটার সড়কপথ নির্মাণ হয়েছে। কিন্তু রেলওয়ের জন্য সরকার কোথাও হাত পাতেনি। যদিও ইদানীং বিশ্বব্যাংকসহ বেশ কিছু ডোনার রেলখাতে অর্থব্যয় করতে আগ্রহী বলে জানা গেছে। সাহায্যকারী রাষ্ট্রগুলো সড়কপথের জন্য সাহায্য দিয়েছে, কারণ বড় বড় রাস্তা হলে তাদের দেশের বাস-ট্রাক চলবে। এসব পরিবহনের পার্টসের বড় বাজার তৈরি হবে।

ট্রেনের কোচগুলোকে আরও আরামদায়ক ও সেবার মান বাড়াতে হবে

ঐ সমস্ত রাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোর ভালো ব্যবসা হবে। আবার এসব ব্যবসার প্রথম সুবিধাগুলো পাবে রাজনীতিবিদরা। ফলে তারা সড়কপথকে উন্নত করার তাগিদ দেখিয়েছে। এক হিসাবে দেখা যায়, ২১০টি ৫ টন ট্রাকের পণ্য একটি মিটারগেজ মালবাহী ট্রেন টানতে সক্ষম। অন্যদিকে একই হিসাবে দেখা যায়, ঢাকা থেকে প্রতিদিন চট্টগ্রামের উদ্দেশে প্রায় ১৮০টির মতো বাস ছেড়ে যায়। অর্থাৎ বাসে প্রতিদিন পরিবহন করে প্রায় ৭৫ শত মানুষ। এই মানুষ পরিবহনের জন্য মাত্র দুটো ট্রেনই যথেষ্ট। কিন্তু ট্রেনের প্রতি নির্ভরতা কমে যাওয়ায় প্রতিদিন মানুষকে ঝুঁকি নিতেও প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যেতে বাস আর ট্রেনের প্রায় সমান সময় লাগে। ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটের জন্য সড়কপথে প্রতি বছর বরাদ্দ থাকে। কিন্তু রেলওয়ের জন্য বাজেট নেই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কর্মকর্তা বলেন, 'দীর্ঘদিন থেকে ঢাকা-লাকসাম একটা সরাসরি রেলরাস্তা বানানোর জন্য আমরা সরকারের ভেতরে তদবির চালাচ্ছি। কোনো সরকারই এই রাস্তাটা করে না। এই রেলপথ হলে ৮০ কিলোমিটার পথ কমে আসতো। তখন সময় আর অর্থ দুটোই কম লাগতো। কিন্তু কোনো সরকারই তা করবে না, কারণ বাস মালিকরা ক্ষতির সম্মুখীন হবে।' পাশাপাশি ট্রাকের তুলনায় ট্রেনে পণ্য পরিবহন অনেক সুবিধাজনক ও সস্তা। কিন্তু সরকার ট্রেনকে উন্নত করার পথে পা বাড়ায়নি, কারণ রেলওয়ের কল্যাণ সাধিত হলে বাস-ট্রাক মালিকদের একচেটিয়া ব্যবসা হবে না। ফলে সুবিধা ভুগীগোষ্ঠী বঞ্চিত হবে। ১৯৪৭ সালে সড়কপথ এ অঞ্চলে ছিল ৬০০ কিলোমিটার, বর্তমানে সেটা এসে দাঁড়িয়েছে ৪৯ হাজার কিলোমিটারে। অন্যদিকে রেলপথ যা ছিল তাই আছে। যমুনা সেতু রেল লিংক প্রকল্পের আওতায় রেললাইনের দৈর্ঘ্য কিছুটা বেড়েছে। অর্থাৎ সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে রেলওয়েকে সড়কপথের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই প্রতিযোগিতার ফল যে শুভ নয় তা ইতিমধ্যেই দেশের মানুষ বুঝতে পারছে। যোগাযোগমন্ত্রী এ বিষয়ে সরাসরি কাউকে দায়ী না করে বলেন, 'সরকারের উদাসীনতা বৈষম্যের প্রধান কারণ। আমরা চেষ্টা করছি এই বৈষম্য কমিয়ে আনতে। দেখেন বাস মালিকরা কিন্তু আমাদের সরকারেও আছে। সুতরাং কাজ করার ক্ষেত্রে সমস্যা কিছু আছে। কিন্তু আমরা সব সমস্যাকে পেছনে ফেলে রেলওয়েকে সামনে নিয়ে যেতে চাই। এটা করতেই হবে।' অর্থাৎ এ রেলপথ উন্নয়নে বড় বাধা হলো বাস ও ট্রাকের মালিক এবং তাদের চক্র।

অহেতুক এই ঝামেলা থেকে যাত্রীকে মুক্ত রার দায়িত্ব রেল কর্তৃপক্ষের

সড়কপথ অনেক বিপর্যয়ের কারণ

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি জাতীয় উন্নয়নে অবশ্যই ভূমিকা রাখে। সে ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কতটা সুষ্ঠু পরিকল্পনার সঙ্গে গড়ে তোলা সম্ভব হলো সেটাও বিবেচনাযোগ্য। ঢাকা শহরের ট্রাফিক জ্যাম আমাদের জাতীয় জীবনে কতটা ক্ষতি করছে তার কোনো হিসাব সরকারের কাছে নেই। অন্যদিকে একটি দেশের সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে সে দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটও বিবেচনায় রাখা দরকার। এটা নিশ্চিত, বাংলাদেশের

সড়কপথের পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়নি।

স্বাধীনতা-উত্তর দেশে বিস্তৃত রেলওয়ে নেটওয়ার্ক ছিল। এই নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের মতো অবকাঠামো থাকলেও অজ্ঞাত কারণে সেটা হয়ে ওঠেনি। নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ। সড়কপথের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বিশাল এসব রাস্তা একেকটি বাঁধে পরিণত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই যা বন্যা ও অন্যান্য পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানির পরিমাণও নেহাত কম নয়। সে তুলনায় রেলওয়ের দুর্ঘটনার পরিমাণ খুব কম। সড়কপথে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। জ্বালানির দাম বাড়ছে। জ্বালানি আমদানির জন্য প্রতিবছর সরকারকে প্রচুর পরিমাণ বিদেশী অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। পাশাপাশি গাড়ি থেকে নির্গত কালো ধোঁয়ায় বন্যা ও অন্যান্য পরিবেশ দূষণও করছে। এক হিসাবে দেখা গেছে, রেলওয়ে যদি ১ শতাংশ পরিবেশ দূষণ করে, সেখানে বাস-ট্রাক করে ৩০ ভাগ। এরপরও সড়কপথের উন্নয়ন অবশ্যই প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সেটা রেলওয়েকে বাদ দিয়ে নয়। বরং রেলওয়ে ও স্টেশনকে কেন্দ্র করে পরিকল্পনা হলে আজকের জটিলতায় পড়তে হতো না। বাংলাদেশে যেসব গাড়ি চলে তার একটিও এ দেশে তৈরি নয়। রেলওয়েও এ দেশে তৈরি হয় না। কিন্তু রেলওয়ে শিল্পে এ এলাকার মানুষের প্রায় শতবর্ষেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। যেটা তারা রেলওয়ের উন্নয়নে কাজে লাগাতে পারে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, রেলওয়ের বিপুলসংখ্যক শ্রমিকের দক্ষতাকে কাজে লাগানো গেলে রেলওয়েই হতে পারতো প্রধান পরিবহন সংস্থা। পৃথিবীর কোথাও রেলওয়ের সঙ্গে বাস-ট্রাক প্রতিযোগিতা করে টেকেনি, বাংলাদেশ ছাড়া। বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের অনেকেই সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেছেন, দাতা সংস্থাগুলো রাস্তা বানানোর জন্য টাকা দেবার আগে রেলওয়েকে যেন উৎসাহ না দেয়া হয় সে প্রতিশ্রুতিও তারা সরকারের কাছ থেকে নিয়েছে।

অন্যদিকে বাস-ট্রাক মালিক সমিতি শুরু থেকেই সরকারের ভেতর লবি করেছে যেন রেলওয়ের কোনো উন্নয়ন না হয়। 'সরকারের ভেতর রেলওয়ের জন্য লবি করার কেউ নেই।'- দুঃখ করে বললেন মকবুল আহমেদ। একেকটি বড় রাস্তা নির্মাণের পেছনে প্রতি বছর যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, তার অর্ধেক অর্থও যদি রেলওয়ের পেছনে ব্যয় করা সম্ভব হতো তাহলে পুরো বাংলাদেশ নেটওয়ার্কের আওতায় চলে আসতো। রেলওয়ের নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠিত হলে বাস-ট্রাক মালিকদের আয় কমে যাবে। শুধু এই ভয়েই সরকারের ভেতরে থাকা বাস-ট্রাকের পক্ষের লবিস্টরা রেলওয়েকে ডোবানোর পরিকল্পনা করেছে। তাতে তারা সফলও। সড়কপথ নির্মাণের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ জমি নষ্ট হয় তা পরিকল্পনা প্রণেতারা মাথায় রাখেননি। লাখ

স্টেশনে টোকাই ও অহেতুক লোকের উপস্থিতি যাত্রীদের নিরাপত্তাহীনতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়

লাখ একর জমি নষ্ট করে প্রায় অর্ধলাখ কিলোমিটার সড়কপথ তৈরিতে এ দেশের জনগণের সার্বিক লাভ কতটা হয়েছে সেটাও একটি গবেষণার বিষয় হতে পারে। তবে একটি কথা বলা যায়, সড়কপথ মানুষের জীবনে যেমন গতি সঞ্চার করেছে, তেমনি জীবনযাত্রার ব্যয় ও জীবনকে বহুগুণে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

বাস-ট্রাক মালিকদের দুর্বৃত্তায়ন

রেলওয়ের উন্নয়নে বাস-ট্রাক মলিকদের দুর্বৃত্তায়ন প্রধান প্রতিবন্ধকতা। একটা কথা চালু আছে, বাস-ট্রাক মালিক পক্ষের লোক রেলওয়ে কর্মকর্তা, সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, এমনকি ট্রেনের চালক-পরিচালকদের ঘুষ দেয়। যাতে ট্রেন সময়মতো গন্তব্যে না পৌঁছায় এবং রেলওয়ের কোনো উন্নয়ন না হয়। এ বিষয়ে ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা বলেন, 'যারা বাস ওনার্স তাদের তো আগ্রহ আছেই। বিআরটিসি বাসই আমরা চালাতে পারি না। বিভিন্ন ঝামেলার কারণে তাদের সঙ্গে একটা চুক্তি হয়েছে। আমি আলটিমেটলি এখান থেকে বেরিয়ে আসবো। কারণ জনগণ সংগঠিত হচ্ছে। তবে ট্রেনের সমস্যার সঙ্গে বাস মালিকদের কোনো সমস্যা নেই।' রেলওয়ে অপারেশন এডিজি খুরশীদ আনোয়ার সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'ট্রেন লেট হওয়া বা ট্রেনের বিশৃঙ্খলার জন্য অনেক কারণ থাকতে পারে। কিন্তু এর সঙ্গে বাস মালিকদের কোনো সম্পর্ক নেই। কোনোভাবেই নেই।' নাম প্রকাশ করতে চান না এমন একজন সাবেক আমলা ২০০০কে বলেন, 'রেলওয়ের জন্য কয়েকজন আমলা ছাড়া আর কেউ নেই কিন্তু সরকারের ভেতর বাস-ট্রাকের জন্য হাজার হাজার লোক আছে। আমার অভিজ্ঞতায় বলে রেলওয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কারো টেকার কথা নয়। সে ক্ষেত্রে ট্রেনকে সময়মতো গন্তব্যে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা থাকতে হবে। মূল সমস্যাটা কিন্তু এখানে। রেলওয়ের দুর্নীতিবাজ কর্মচারী বাস মালিকদের কাঁচা টাকা কাছে এমনভাবে পরাস্ত যে, কোনো ট্রেনই এখন সময়মতো গন্তব্যে পৌঁছায় না।'

রেলওয়ে বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান মকবুল আহমেদ সাপ্তাহিক ২০০০কে তার একটি অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, 'ফেনী-বেলুনিয়া সংযোগ রেলওয়ে সরকার চাপ দিয়ে বন্ধ করে দিল। সরকারের বক্তব্য ছিল, ঐ লাইনে রেলওয়ে লাভ করে না। যা হোক, আমরা ঐ লাইন বন্ধ করে দিলাম। পরে সেখানে বাস নামানো হয়। যার মালিক ছিলেন তৎকালীন একজন মন্ত্রী। আমাদের বুঝতে বাকি থাকলো না, ফেনী-বেলুনিয়া লাইন বন্ধ করে দেয়া হলো কেন?' অনুসন্ধানে জানা গেছে, সরকার এ পর্যন্ত কালুখালী-মধুখালী, ফেনী-বেলুনিয়া, নরসিংদী-মদনগঞ্জ, লালমনিরহাট-মোগলহাট, ভেড়ামারা-রায়টা, ফরিদপুর-পাকুরিয়ার রেলওয়ের সংযোগ সড়কগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। এ জায়গাতে এখন বাস হলো একমাত্র যান। সাবেক রেলওয়ে মহাপরিচালক আব্দুর রহিম বলেন, 'আমাদের জাতীয় চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে, যার শিকার সব সেক্টর। সব সেক্টরের লোক চুরি করে, কারণ তাদের কোথাও ঘাটতি রয়েছে। মুশকিল হলো এই ঘাটতি পূরণের কোনো উদ্যোগ সরকার নেয়নি। ফলে আমরা দুর্বৃত্তে পরিণত হয়েছি। দুর্নীতি আমাদের সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠেছে।'

বাস-ট্রাক মালিকদের দুর্বৃত্তায়ন কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা আসলে অনুমান করা কঠিন। অনেকে এমন কথাও বলেছে, এমন কোনো লেভেল নেই যেখানে তারা ঘুষ দেয় না। পাশাপাশি লাঠির জোর তো আছেই। উদাহরণস্বরূপ জাফলং এলাকার কথা বলা যায়। সেখানে সরকার নিয়ন্ত্রিত বিআরটিসি বাস চালানোর চেষ্টা করলে বেসরকারি বাস মালিক ও তাদের শ্রমিকরা রাস্তা-ঘাট বন্ধ করে দেয়। সরকারকে বাধ্য করে বিআরটিসি তুলে নিতে।

ইস্টিশনের রেলগাড়িটা মাইপ্যা চলে না ঘড়ির কাঁটা

আগে রেলওয়ের অনেক সুবিধা ছিল, সেগুলো আজ নষ্ট হয়ে গেছে। পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। সরকারি কাজের মতো বাংলাদেশের ট্রেনগুলোও চলার পথে মাঝে

মাঝেই বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য যোগাযোগমন্ত্রী ও রেলওয়ে কর্মকর্তারা জোর দিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, বন্ধ হয়ে যাওয়া এসব লাইন আবার চালু হবে। এর জন্য ইতিমধ্যে বরাদ্দও দেয়া হয়েছে। এমনকি ঢাকা-লাকসাম, ঢাকা-ভৈরব রাস্তার ডুয়েল লাইনের জন্য ৯৭ মিলিয়ন ডলারের বরাদ্দ দেয়া হবে। ভ্রমণের ক্ষেত্রে মানুষ চায় সময়ানুবর্তিতা ও নিরাপত্তা। ট্রেনে নিরাপত্তার খুব একটা সমস্যা না থাকলেও সময় মেনে চলায় সমস্যা অন্তহীন। সময়গুলো এমনভাবে করা, যাতে মানুষ রেলওয়েতে ভ্রমণে নিরুৎসাহিত হয়। আবার ছেড়ে আসা ট্রেনগুলোও মাঝপথে অকারণে থেমে যায়। ফলে অনেক দেরিতে ট্রেন গন্তব্যে পৌঁছায়। উদাহরণ হিসেবে শিলেগুঁড়ি নামক একটা ট্রেনের কথা বলা যায়। ট্রেনটি পার্বতীপুর থেকে গোয়ালন্দ ঘাট পর্যন্ত আসে। এই ট্রেনটি সকালের দিকে গোয়ালন্দ থেকে কুষ্টিয়ার দিকে ছেড়ে যায়। এই একটি ট্রেনের ওপর নির্ভর করে শত শত অফিসগামী মানুষ ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রী। আজ থেকে ৭-৮ বছর আগেও ট্রেনটি মোটামুটি সঠিক সময়ে আসতো বলা যায়। রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া সড়কে বাস চালু হবার পর এই ট্রেনটি এতো দেরি করে যে, আজকের ট্রেন আগামীকাল পৌঁছালেও ঐ এলাকার লোক অবাক হয় না। চট্টগ্রামগামী মহানগর বা সুবর্ণ ট্রেনের কথা বলা যায়। বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেবার ফলে ট্রেন দুটি ভালোই চলতো। ইদানীং এই ট্রেন দুটিও মাঝপথে অকারণে থেমে যায়, দেরি করে গন্তব্যে পৌঁছায়। এরকম দেশের প্রায় সব আন্তঃনগর, লোকাল, মেইল ট্রেন সময়ের ব্যাপারে উদাসীন। এর জন্য মূলত রেল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাই দায়ী। রেলওয়ে কর্মকর্তারা অবশ্য ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন। তাদের মতে, মাঝপথে ট্রেন থেমে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো ত্রুটিপূর্ণ রেল লাইন। মান্ধাতা আমলের লাইনে গত ৩০ বছরে তেমন কোনো সংস্কার করা হয়নি। কিন্তু প্রতিদিন যখন একই ঘটনা ঘটে, তখন শুধু লাইন নষ্ট এই বক্তব্য মানা যায় না। ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা এ বিষয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, 'বাংলাদেশের সবটুকু রেল লাইন ঠিক করা হবে। ডবল লাইন আমাদের প্রধান প্রায়োরিটি। অন্যদিকে স্টেশনের উন্নয়ন, সিগন্যালিং উন্নয়নসহ সব ধরনের কাজ আমরা করছি। অধিকাংশ কাজের ফল মানুষ ২০০৬ সালের মধ্যে পাবে।' অবশ্য রেলওয়ে যে মরে যাচ্ছে, সময় মেনে না চলা তার একটা কারণ যোগাযোগমন্ত্রীও তা স্বীকার করেন।

অন্যদিকে ট্রেন ছাড়ার সময়টিও অদ্ভুত। যেমন খুলনা থেকে নকশীকাঁথা নামক একটি মেইল ট্রেন ছেড়ে আসে গভীর রাতে। অন্যদিকে রাজশাহী থেকে গভীর রাতে আন্তঃনগর ট্রেন যমুনা ছেড়ে আসে গোয়ালন্দ ঘাটের উদ্দেশে। প্রশ্ন হলো, গভীর রাতে ট্রেন যদি ছেড়ে আসে, তখন যাত্রী পাবে কিভাবে? এ বিষয়ে রেলওয়ের সাবেক একজন কর্মকর্তা বলেন, 'ট্রেনের টাইমিং তো অফিসাররা বসে

বাংলাদেশের সকল অঞ্চলের লাইনগুলোকে ডাবল লাইনে রূপান্তর করা না গেলে কোনো লাভ হবে না। কারণ আমাদের ভবিষ্যতের শুরু হবে এখন থেকেই..

নির্ধারণ করেন। সে ক্ষেত্রে নিশ্চয় টাইমিংয়ের সঙ্গে আরো কিছু বিষয় বিবেচনা করে।' মকবুল আহমেদ সরাসরি রেল কর্তৃপক্ষকে দায়ী করে বলেন, 'রেলওয়ের তো কেউ নেই। একজন ডিজি আছেন, তিনি গার্ড/বার্ড নিয়ে বসে আছেন। সাধারণ লোকের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। রেলওয়ে কে চালাচ্ছে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। রেলওয়ের বিভিন্ন সার্ভিসের জন্য লোক রাখা আছে, তারা কেউ কাজ করে না। তাই আমি বলি, আপনারা সৎ সন্তান জন্ম দেন। আগে রেলওয়ে এক ছিল। এখন পূর্ব-পশ্চিম দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কারো সঙ্গে কারো মিল নেই। আরে ভাই, ট্রেনের টাইমিংয়ের দায়িত্ব প্রশাসনের, কিন্তু এর জন্য পরিকল্পনার দরকার নেই। প্রয়োজন বুদ্ধিমত্তার। এখন টাইমটেবল যা করা হয় তা বাস মালিকদের সুবিধার জন্য।' যোগাযোগমন্ত্রী ও রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও এ অভিযোগটি স্বীকার করলেন। বিষয়টি তাদের বিবেচনায় আছে বলেও জানালেন। এডিজি খুরশীদ আনোয়ার বলেন, 'টাইমিংয়ের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা আছে, যেগুলো আমরা রিশাফল করার চেষ্টা করছি।'

সুতরাং ট্রেনের সময়ের ব্যাপারটায় গুরুত্ব দিতে হবে। অন্যদিকে ট্রেনের স্বল্পতাও বড় সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে রেলওয়ে কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছে। রেলওয়ে এডিজি অবকাঠামো এমডি আবদুল্লাহ জানান, আগামী ২ বছরের মধ্যে দেশে ১৩০টি কোচ আসবে। দক্ষিণ কোরিয়া থেকে ১১টি লোকেমেটিভ ডিজেল ইঞ্জিন আসবে। এগুলো চলে এলে ট্রেনের স্বল্পতা কমে আসবে। ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো গেলে, সময় মেপে ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করা গেলে ভবিষ্যতে রেলওয়ে হয়ে উঠবে জীবনের অপরিহার্য অংশ।

ভবিষ্যতের শুরু এখানেই

ইতিমধ্যে অনেক বেলা গড়িয়েছে। সময় নষ্ট করার সময় আর নেই। বাংলাদেশ রেলওয়ের ভবিষ্যতের শুরু হতে পারে এখান থেকেই। শুরুতেই বলা হয়েছে বাংলাদেশের অধিকাংশ ট্রেন লাইনের গন্তব্য কোলকাতামুখী। এখন দেশের সকল ট্রেন লাইনের মুখ ঢাকার দিকে ফেরাতে হবে। অর্থাৎ রেলওয়েকে ঢাকাকেন্দ্রিক করতে হবে। পাশাপাশি রেলওয়ে ইঞ্জিন আর প্যাসেঞ্জার কোচের সংখ্যাও বাড়ানো প্রয়োজন। অন্যদিকে আরও রেলপথ বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে। এর জন্য খরচ যে খুব বেশি তাও নয়। ঢাকাকেন্দ্রিক ৪ লাইন বিশিষ্ট রেলপথের যে প্রস্তাব বিশেষজ্ঞরা দিয়েছেন এটাকে গুরুত্বসহকারে সরকারের বিবেচনা করা উচিত। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর, ঢাকা-সাভার সড়কে রেললাইন ও রেল বাড়ানো উচিত। রেল লাইন ছাড়া প্রয়োজন গাড়ি চলার মাত্র কয়েকটি ওভার ব্রিজ। নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুরে কয়েকটি ওভার ব্রিজ করলেই চালু হতে পারে। ঢাকাকে বাঁচাতে এর কোনো বিকল্প নেই। পাশাপাশি ঢাকা-মানিকগঞ্জ একটি নতুন রেলপথ চালু করার কথাও বিবেচনা করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে টাকার চেয়ে সরকারি সিদ্ধান্তই গুরুত্বপূর্ণ। সরকার গুরুত্ব সহকারে ঢাকাকেন্দ্রিক রেল প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে এটা অবশ্যই আশার কথা।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ম্যাগনেটিক ট্রেনের কথা যোগাযোগমন্ত্রী জোরে সোরে বলেছেন। কখনও কখনও ভূগর্ভস্থ ট্রেনের কথাও শোনা গেছে। ভূগর্ভস্থ ট্রেনের একটি প্রকল্প এডিপিতে আছে। তারা ফিজিবিলিটি স্টাডি করছে বলে জানিয়েছেন এক কর্মকর্তা। বিশেষজ্ঞরা ম্যাগনেটিক ট্রেনের লাভবান হবার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিয়েছেন।

ভূগর্ভস্থ ট্রেন লাইনের ধারণাটি ভালো কিন্তু ঢাকায় এটা বাস্তবায়ন জটিল ও কঠিন। কারণ ঢাকার ভূগর্ভে স্যুয়ারেজ, টিএন্ডটি, গ্যাসের লাইনগুলো এতো বিচ্ছিন্নভাবে আছে, ভূগর্ভস্থ রেললাইন করতে গেলে পুরো ঢাকা অচলও হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সম্ভাব্য সবচেয়ে ভালো বিকল্প হলো মনোরেল। ভূগর্ভস্থ টিউব লাইনের সম্ভাবনাকে একেবারে বাতিল করে দিচ্ছেন না বিশেষজ্ঞরা। সেক্ষেত্রে টিউব লাইনের দায়িত্ব রেলওয়ে নয়, অন্য কাউকে নিতে হবে। রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অবশ্য ঢাকা শহরের ভেতর ও এই

কেন্দ্রিক মনোরেল করার সম্ভাবনাই বেশি বলে জানিয়েছেন।

ম্যাগনেটিক, টিউব, বুলেট ট্রেন সবগুলোই সম্ভাবনা। এরমধ্যে ম্যাগনেটিক ট্রেন চীনের সাংহাই ছাড়া আর কোথাও পরীক্ষিত নয় বলে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। তবে সরকার গুরুত্বসহকারে ভাবলে মনোরেল বা টিউব ট্রেনের ধারণাকে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। কিন্তু সে জন্য চাই সরকারি উদ্যোগ আর রেল কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা।

বিশেষজ্ঞদের অনেকে রেলওয়ের বেশ কিছু সার্ভিসকে বেসরকারিখাতে ছেড়ে দেয়ার কথা বলেছেন। যেমন টিকেট, ট্রেনের ভেতরের ক্যাটারিং, এমন কি ঢাকাকেন্দ্রিক ডাবল বা ৪ লাইন বিশিষ্ট রেল লাইন নির্মাণ ও তা অপারেটের দায়িত্বও বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া দেবার কথা বলেছেন কেউ কেউ। ইতিমধ্যেই কমলাপুর স্টেশনের টিকেটিং বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। যদিও তার ফল ভালো না। টিকেট প্রায় সময়ই ব্লাকারদের হাতে থাকে, কাউন্টারে নয়। যোগাযোগমন্ত্রী রেল কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন এটা যে কোনো মূল্যে প্রতিরোধ করতে। কয়েকটি ট্রেন বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়ার পর ভালো ফল পাওয়া গেছে। যদিও এসব ট্রেন বাস, ট্রাক মালিকদের দুর্বৃত্তায়নের হাত থেকে বাদ পড়েনি। অন্যদিকে কমলাপুর থেকে উত্তরা পর্যন্ত যে রেলস্টেশনগুলো আছে তার মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেলস্টেশন করা যেতে পারে কেউ কেউ এমন প্রস্তাব করেছেন। একটি সূত্র জানিয়েছে, এরশাদ সরকারের আমলে সাভারকে কানেক্ট করে আরিচা নগরবাড়ী হয়ে ঈশ্বরদী পর্যন্ত রেলওয়ে লাইন করার প্রস্তাব ছিলো। সাবেক একজন রেলওয়ে সচিব বলেন, 'প্রস্তাবটা এখনও বিবেচনা করা যায়। কারণ আরিচা পর্যন্ত চমৎকার সড়কপথ রয়েছে। আমার মনে হয় পরিকল্পনাটা পরিবর্তন করে দৌলতদিয়ার সঙ্গে সংযোগ ঘটাতে পারলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। তবে অবশ্যই সব ক্ষেত্রে ডাবল লাইন করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের সকল অঞ্চলের লাইনগুলোকে ডাবল লাইনে রূপান্তর করা না গেলে কোনো লাভ হবে না। কারণ আমাদের ভবিষ্যতের শুরু হবে এখন থেকেই।'

সমস্যা আছে সমাধানও আছে

রেলওয়ে সম্ভবত বাংলাদেশের একমাত্র সংস্থা যারা লাখ লাখ একর জমির মালিক। এ জমির সঠিক ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে বছরে কয়েক হাজার কোটি টাকা আয় সম্ভব। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রেলওয়ের অসাধু কর্মকর্তারা সামান্য টাকার বিনিময়ে এসব জমি ব্যক্তি মালিকানায় লিজ দিয়ে দিচ্ছে। এসব লিজের মালিক স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। বাংলাদেশ রেলওয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, হাজার হাজার একর জমি রাজনীতিবিদ, সন্ত্রাসীরা দখল করে নিয়েছে।

রেলওয়েকে জীবনযাপনের অংশ করে নেয়ার দায়িত্ব সকলের

শুধু ভূমি ব্যবস্থাপনার আয়কৃত অর্থ পেলে রেলওয়েকে কারও ওপর নির্ভরশীল হতে হবে না।

রেলওয়ের প্রধান সমস্যা হলো দুটি। এক. লাইনের দ্বৈততা, দুই. মান্ধাতা আমলের সিগন্যালিং ব্যবস্থা। বাংলাদেশে মোটামুটি মিটার গেজ, ব্রডগেজ ও ন্যারোগেজ এই ৩ ধরনের লাইন বিদ্যমান। রেলওয়ের সাবেক সকল কর্মকর্তাই বলেছেন রেল লাইনকে হয় মিটার বা ব্রডগেজ আনতে হবে। লাইনের সমস্যার কারণে রেলওয়েকে মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। জানা গেছে, এই বিষয়টি নিয়ে রেলওয়ে কর্মকর্তারা সরকারি পর্যায়ে দেন দরবার করলেও কোনো লাভ হয়নি। লাইনের পাশাপাশি ম্যানুয়াল সিগন্যালও ট্রেন চলাচলে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটায়। বিশ্ব অনেক এগিয়ে গেছে। শুধু বাংলাদেশের ট্রেনগুলোকে দেখলেই মনে হয় পৃথিবী এখনও ষোড়শ শতাব্দীতে। সাবেক একজন ডিজি বলেন, 'অটোমেটিক সিগন্যালের কোনো বিকল্প নেই। কারণ রেলপথের সিগন্যালের এতো খারাপ অবস্থা যে ট্রেনগুলো দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলছে এজন্য তারা ধন্যবাদ পেতে পারে।'

বাংলাদেশে গড়ে ১.১৫ কি. মি. একটি করে লেভেল ক্রসিং আছে। যার মধ্যে মাত্র ৩০৭টিতে রেলওয়ের লোক আছে। ১০৩৪টিতে কোনো লোক নেই। ১০৬০টি লেভেল ক্রসিং অবৈধ। ট্রেনের কোচ, ইঞ্জিন, মালবাহী গাড়িগুলোর অবস্থা সত্যিই খুব খারাপ। রেলওয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, 'এখন সময় এসেছে সব কিছু পুনর্বিন্যাস করার। নতুবা রেলওয়ে ধ্বংস হতে বাধ্য।' যোগাযোগমন্ত্রীও এসব অভিযোগ মানেন এবং রেলওয়েকে দিয়ে আশার সঞ্চার করতে চান।

এসব সমস্যার সমাধান কঠিন কিছু নয়। খুব যে বেশি অর্থ দরকার তাও নয়। প্রতিবছর সরকার সড়ক পথে যা অর্থ ব্যয় করে তার শতকরা ২৫ ভাগ অর্থ রেলপথের পেছনে ব্যয় করা সম্ভব হলে, আগামী ৫ বছরের মধ্যে রেলওয়েতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। এ জন্য প্রয়োজন শুধু যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের আন্তরিকতা। শত বছর ধরে এ এলাকার সভ্যতা বিনির্মাণ আর সংস্কৃতির বিকাশে রেলওয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশের মানুষ এখনও রেলওয়েতে ভ্রমণ করতে চায়। স্বল্প খরচে ও নিরাপদে ভ্রমণের এমন ব্যবস্থা থাকতে তাকে অবহেলা কেন?

রেলওয়ের ভবিষ্যতের যদি সূত্রপাত এখন থেকেই হয় তবে দেখা যাবে আসছে বড় বড় প্রজেক্ট। নতুন লাইন বসাবার পরিকল্পনা, অথবা নব্যতর টেকনোলজি। আমাদের টেকনোলজি যা আছে তা তার ওপর গড়ে উঠবে নতুন রেল ব্যবস্থা। হাজার মাইল লাইনের স্ট্রাকচার আছে তা নতুন করে সংগঠিত করতে হবে। সমস্যা মূলত সৎ মানুষের, পরিচালনার। টিকেট চেকার যেমন অসৎ, যাত্রীরা সেই সুযোগে অনিয়ম করে। ফিটিং চুরি, স্লিপার চুরি ঠেকাতে হবে। রেলওয়ে পুলিশকে সচল করতে হবে। যা আছে তাই নিয়ে এগুতে হবে। ইউনিয়ন আর সমিতি রাজনীতি ও মাস্তানমুক্ত করতে হবে।

একটি স্বপ্ন

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা হয়তো স্বপ্নগাথা লিখছি। সমাজ-সরকার দুর্বৃত্ত দ্বারা কুক্ষিগত। স্বপ্ন দেখা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। রেলমন্ত্রী আশার বাণী শুনিয়েছেন। আমরা স্বপ্ন দেখি জামিল আহমেদ তার সন্তানদের নিয়ে আবার রেল ভ্রমণ করতে পারবেন। হয়তো একদিন তার নাতিনকে একা উঠিয়ে দেবেন এক অচেনা স্টেশন থেকে। পাশের পরিবারকে বলবেন, মেয়েটি একা যাচ্ছে ঢাকা। ইউনিভার্সিটি ভর্তি হবে। পরিবার অভয় দেবে, বলবে, আরে ভাববেন না, আমাদেরই মেয়ে তো। নির্ভাবনায় জামিল আহমেদ নেমে দাঁড়াবেন প্লাটফর্মে। চোখের পানি মুছে সাদা রুমালটা নাড়বেন।

এই ছিল আমাদের কালচার। ফিরে আসুক সেই কালচার।

Qwe : এ এল অপূর্ব | আনোয়ার মজুমদার
মডেল : ZwIKv